ভূমিকা

ভূমিকা

"ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে; রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে;
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে;
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।
. . . . . .
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ'পরে
ওরা কাজ করে॥"[১]

'আরোগ্য' কাব্যের 'ওরা কাজ করে' কবিতায় কবিগুরুর এই বাণী পরম ও চরম ঐতিহাসিক সত্যকে নির্দেশ করেছে। রোগশয্যায় শায়িত কবি জীবনের অন্তিম প্রহরে মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে অনুভব করেন,—যুগ যুগ ধরে বিজিত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইতিহাসের ভগ্নস্তূপে মূক হয়ে আছে, আর তার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে যুগান্তরের খেটে খাওয়া-শ্রমজীবী মানুষের বিপুল কর্মস্রোত। শাসকের রক্তচক্ষু আর অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি নয়, দেশের সাধারণ মানুষই প্রকৃত ইতিহাসের রচয়িতা।

সাহিত্য মানব জীবনের অনুকৃতি; আর কবি তাঁর পারিপার্শ্বিক জগৎ ও দেশ-কালের মধ্যে থেকেই উপকরণ আহরণ করে তাঁর নিজস্ব জগৎ গড়ে তোলেন। এ কারণেই স্রষ্টার সৃষ্টিতে দেশ-কালের প্রভাব পড়বেই। যুগ যুগ ধরে কবি ব্যক্তিত্বের নিপূণ সমাজ বীক্ষণের তথ্য সমৃদ্ধ ফলাফল পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্টিতে। তাই ইতিহাস যেখানে মূক, সাহিত্য সেখানে সরব। ইতিহাসে আক্রমণকারী বা শাসককূলের ভাগ্য নির্ধারণের বিবরণ যতটা থাকে, সাধারণ জনজীবনের কথা সেখানে ঠিক ততখানি নীরব। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে বাঙালীর ইতিহাসের অভাবের কথা বলেছিলেন এবং বাংলাদেশের যথার্থ তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনার উপদেশ দিয়েছিলেন।[২] বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস বলতে বোঝাতে চেয়েছিলেন, দেশ শাসন, সমাজব্যবস্থা, ধর্মবোধ, অর্থনীতি, শিল্প. বাণিজ্য, কৃষি নানাবিধ বিষয়ের তথ্য সমৃদ্ধ একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের কথা। এ বিষয়ে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা

'বাঙালীর ইতিহাস' ও ডঃ অতুল সুরের লেখা 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন' বাঙালীর ইতিহাস আলোচনার গ্রন্থ হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে।

মধ্যযুগের সাহিত্য মূলত ধর্মাশ্রিত হলেও দেখা যায় এই সাহিত্যে, বিশেষত মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাংলার মাটি ও মানুষের বহু কথা, বহু উপাদান বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এই সমস্ত উপাদান আহরণের মধ্যে দিয়ে বাংলার জাতি, সমাজ ও দেশের অনন্য চিত্র অঙ্কিত হতে পারে এবং এর মধ্যে থেকেই পরিবর্তিত কালের বিবর্তিত চেহারা ধরা যেতে পারে। বাংলা মঙ্গলকাব্য নিয়ে বহু গবেষণা হলেও লক্ষ করা গেছে যে, ইতিহাসের তথ্য চয়নের কাজই বেশী হয়েছে। কখনো মঙ্গলকাব্যের বাঙালী সমাজ, কখনো লৌকিক উপাদান, কখনো নরনারী চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু বাঙালী সমাজের বিবর্তনশীল চরিত্র নিয়ে আলোচনা প্রকাশনা বা গবেষণা কোনদিকেই তেমন লক্ষ করা যায় না। এ বিষয়ে আমার গবেষণা নির্দেশিকা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁরই পরামর্শক্রমে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনকে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে গবেষণা নির্দেশিকার উপদেশ নির্দেশ শিরোধার্য করেই এগিয়ে যেতে হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা হল তিনটি—মঙ্গলকাব্য সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ও বৈষ্ণবপদসাহিত্য। অনুবাদ সাহিত্য ও বৈষ্ণবপদসাহিত্য অনেকটাই আদর্শায়িত সাহিত্য, সেখানে রচয়িতারা ইহলৌকিক জীবনকে উপেক্ষা করে কবি কল্পনা ও সীমাহীন উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। একমাত্র মঙ্গলকাব্যের কবিগণ দেবকথা নির্ভর কাব্যকাহিনী গ্রহণ করেও বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করেননি। তাই ইতিহাস আলোচনায় মঙ্গলকাব্যের যতটা গুরুত্ব আছে অনুবাদ সাহিত্য বা বৈষ্ণবপদসাহিত্যের ঠিক ততখানি গুরুত্ব নেই। এ কারণেই মধ্যযুগীয় বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে মঙ্গলকাব্যকেই গ্রহণ করা হয়েছে। তবে সাহিত্য-ভিত্তিক ইতিহাস আলোচনায় কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকবেই; কেননা কবিরা ইতিহাস রচনা করতে বসেননি—সাহিত্য রচনা করেছেন। ফলে ঐতিহাসিক তথ্য আহরণে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,- "কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা ইহাতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষের সন্ধান করেন।" মঙ্গলকাব্যের মধ্যে থেকে সাহিত্যের উপাদান চয়নে একথা মনে রাখা উচিত। কাব্য রচনা করতে গিয়ে কবি কল্পনা শক্তির ব্যবহার করে থাকেন, তাই তথ্য আহরণে সচেতন থাকা প্রয়োজন। আমাদের আলোচনা অবশ্য অনেকটাই জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধানের মত।

সমাজ চিত্র আর সমাজ ইতিহাস এক নয়, আর ইতিহাস কোন স্থাবর বস্তু বিশেষও নয়। সমাজ চিত্রে শুধুমাত্র সমাজের রীতিনীতি, আচার-বিচার, খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির

সামগ্রিক উপস্থাপনা বোঝায়। কিন্তু সমাজ ইতিহাস বলতে যে সমস্ত বিষয়গুলি সমাজ সম্পৃক্ত, যেমন—রাজ্যশাসন, ধর্মবোধ, সমাজ পরিকাঠামো, অর্থনীতি ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ রূপকে বোঝায়। তাছাড়া ইতিহাস প্রস্তরখণ্ড মাত্র নয়, মানুষই ইতিহাসের মূল ভিত্তি, তাই এখানে যুগ পরিপ্রেক্ষিতে আপামর মানব স্বভাব, তাদের বোধ-অভিব্যক্তিকেও চিহ্নিত করে। কেননা প্রতিটি জাতির খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-বিচার থেকে ধর্ম, চিন্তা-চেতনা এমন কি তাদের আচরণগত বৈশিষ্ট্যও স্বতন্ত্র। তাই এখানে শুধুমাত্র সমাজচিত্র বলে সঙ্কীর্ণ না করে সমাজ ইতিহাস বলা হয়েছে।

ইতিহাস স্থাবর নয়, জঙ্গমতাই ইতিহাসের ধর্ম। দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ধর্মবোধ, আচার-আচরণ, খাদ্যবোধ, পোশাক-পরিচ্ছদ ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে। শুধু তাই নয়, মানব স্বভাবও বদলে যেতে থাকে। পঞ্চদশ শতক থেকে যে মঙ্গলকাব্যের জয়যাত্রা শুরু হল, সেখানে দেখা যাচ্ছে একটা প্রচলিত গঠনরীতি মাথায় রেখেও কাব্য আঙ্গিক ও কাব্য বিষয়ের তারতম্য ঘটে যাচ্ছে। মধ্যযুগে যেহেতু দৈবাদেশ ভিন্ন মানুষের করণীয় কিছুই ছিল না, তাই কাব্য বিষয় পরিবর্তিত হয়েছে দৈব নির্দেশেই। মধ্যযুগে মানুষের ধর্মবোধের পরিবর্তনই কাব্য আঙ্গিকের বিবর্তন ঘটায়। সমাজের পরিবর্তনশীলতা সাধারণভাবে অনুভব করা দুষ্কর, তাই কাব্যরীতির পরিবর্তনের মধ্যে থেকে অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের মধ্যে থেকেই সমাজ ইতিহাসের বিবর্তন ধরা সম্ভব। তাই মঙ্গলকাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তনকে জানতে হলে মঙ্গলকাব্যের বিবর্তনের ধারায় সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন লক্ষ করা প্রয়োজন।

প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি মোটামুটি পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কালসীমায় রচিত হয়েছে। স্থূল বিভাজন অনুযায়ী পঞ্চদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল, ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল, সপ্তদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গল কাব্যকে ধরা যেতে পারে। প্রতিটি যুগ পরিপ্রেক্ষিতেই ঐ কাব্যগুলির উদ্ভব ও বিকাশের কারণ নিহিত আছে। সুতরাং ঐ যুগ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যেই সমকালীন ইতিহাসের ছায়াপাত আছে, তাই কাব্যধারা পরিবর্তনের মধ্যে সমাজ ইতিহাসের বিবর্তন খোঁজা একটি সার্থক প্রয়াস। কাব্যধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ-মানসের পরিবর্তন কাব্যে কিভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে, লিপিবদ্ধ করাই এই গবেষণা নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

এই গবেষণা নিবন্ধের পদ্ধতি মূলত বিশ্লেষণাত্মক। প্রাপ্ত তথ্যাবলীকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সামাজিক বিবর্তন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মঙ্গলকাব্যের বিবর্তন যেহেতু গ্রাম্য সমাজের প্রেক্ষাপটেই ঘটেছে, সেহেতু সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন বলতে এখানে তৎকালীন বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনকেই বোঝানো হয়েছে। বলাই বাহুল্য এই গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ। একারণেই,ইতিহাস সমাজকেন্দ্রিক, ধর্মকেন্দ্রিক নয়। ধর্মকে সামনে রেখেই মধ্যযুগের সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, কেননা ধর্মের অনুশাসনই সামাজিক পরিকাঠামো তৈরীর

নিয়ন্তা।

মঙ্গলকাব্যগুলি দেবকথামূলক সাহিত্য হলেও রচয়িতা কবিগণ দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবনের গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি, বরঞ্চ বলা যায় দেবতাকে পিছনে ফেলে এখানে মানবকথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। কবিরা ধর্মকথার মোড়কে আপন আপন সমাজের খুঁটিনাটি তথ্য পরিবেশন করেছেন, সে সমস্ত তথ্যগুলি একত্রিত করে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজের সামগ্রিক রূপ পাওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির সাহিত্যে অতীত ইতিহাস লুকিয়ে আছে। সেই ইতিহাসে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত ও উত্থান-পতনের কাহিনী উদ্ধার করা যেতে পারে এই সব সাহিত্য থেকে। কবিরা যতই কল্পনার আকাশে উড্ডীন থাকুন না কেন, তা দেশ-কালের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত নয়। হয়ত ইতিহাসের সমান্তরাল ধারার সঙ্গে তার মিল না হতে পারে, তবে সাবধানে তার মধ্যে থেকে লোকজীবনের বিচিত্র সাক্ষ্য পাওয়া যেতে পারে। তাই তথাকথিত ইতিহাস যেখানে নীরব হয়ে থাকে সেখানে সাহিত্যের ইঙ্গিত মাত্র ইতিহাসের গতিপথকে চিনিয়ে দিতে পারবে। এ সমস্ত তথ্যে কালগত ভিন্নতা ব্যতিরেকেও কবিদের ভৌগোলিক অবস্থানগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন মনসামঙ্গলের পরিব্যাপ্তি পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ ব্যাপী, সুতরাং তিন বঙ্গের প্রাপ্ত তথ্যাদিতে ভিন্নতা সামান্য হলেও আছে। প্রায় একই কথা বলা যায় চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্যান্য কাব্যগুলি সম্পর্কেও। তাছাড়া পঞ্চদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে সমাজ ইতিহাসের তারতম্য দেখা যায়। আবার সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে রাঢ়বাসীর যে শ্রেণীচরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে তা অন্যান্য কাব্যে দুর্লক্ষ। শিবায়ন ও অন্নদামঙ্গল আরও ভিন্নতর দেশ-কালের পটভূমিতে রচিত হওয়ায় সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। কাজেই মঙ্গলকাব্যগুলিতে খাদ্য-পানীয়, আচার-বিচার, সংস্কার-বিশ্বাসগত ভিন্নতা তো বটেই, তাছাড়াও যুগ পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মবোধ মনন-মানসিকতাগত পরিবর্তনগুলির গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বর্তমান গবেষণা নিবন্ধের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গবেষণা-কার্যে মধ্যযুগের সাহিত্যের উপাদান গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা আছে। প্রথমতঃ কবিরা কাব্য রচনা করতে গিয়ে কল্পনা ও লোকশ্রুতির ব্যবহার করেছেন. তাই কল্পনা ও লোকশ্রুতি নির্ভর তথ্য থেকে বাস্তবসম্মত তথ্য নির্বাচনে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কালানুক্রমিক বিবর্তনরেখা তৈরীতে প্রধান অন্তরায় সৃষ্টি করেছে সঠিক কালক্রম অনুসারে কবিদের সময়কাল নির্ণয়ের জটিলতা। এই অসুবিধা থাকায় সব সময় যে সরাসরি প্রাপ্ত তথ্যগুলি গ্রহণ করা হয়েছে তাই নয়, অনেকক্ষেত্রে কাব্যে উল্লিখিত বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন দেবদেবীর চরিত্রগত বিবর্তন, মানুষের অবস্থানগত বিবর্তন, ধর্মমঙ্গলে ডোমদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান কিংবা প্রধান দেবদেবীমঙ্গলের স্থলে অপ্রধান দেবদেবী মঙ্গল বা পৌরাণিক

দেবদেবী মঙ্গল সৃষ্টি ইত্যাদি। এর মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটের পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করে সময়কাল ও বিবর্তনের ধারাটিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় না গিয়ে তথ্য ও ঘটনা বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই গবেষণা নিবন্ধে সুস্পষ্ট দু'টি ভাগ রয়েছে, তথ্য সংগ্রহ ও সংগৃহীত তথ্যের আলোকে সমাজ বিবর্তনের রূপরেখা তৈরী করা। তথ্যসংগ্রহ ঠিকমত না হলে বিবর্তনের ধারাটিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। গবেষণা নিবন্ধের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রধান মঙ্গলকাব্য-ধারা থেকে সমাজ ইতিহাসের উপাদান চয়ন করা হয়েছে। একারণেই দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে তথ্য সংগ্রহের পাল্লা অনেক ভারী হয়েছে। কিন্তু গবেষণা নিবন্ধের শিরোনামের দিকে লক্ষ রেখেই অষ্টম অধ্যায়ে যুক্তি সহকারে সর্বস্তরের বিবর্তন দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ প্রতিটি অধ্যায়েই সমাজ বিবর্তনের রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে. এই বিবর্তনের রূপরেখা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সর্পিল। বিশেষ করে মধ্যযুগের সাহিত্যকেন্দ্রিক আলোচনায় সঠিক কালক্রম অনুযায়ী প্রাপ্ত পুঁথির নির্দিষ্ট কাল নির্দেশের অভাব বিবর্তনের রূপরেখা তৈরীতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

যদিও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সকল মঙ্গলকাব্যগুলিকে গ্রহণ করা হয়নি কেবল প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলির প্রধান কবিদের রচনাই গ্রহণ করা হয়েছে। তথাপি আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য অপ্রধান মঙ্গলকাব্য ছাড়াও অনুবাদ সাহিত্য, চৈতন্য জীবনী কাব্য, রোমাণ্টিক-প্রণয় কাব্য এবং আধুনিক সাহিত্যকেও সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার হয়েছে। আধুনিক যুগের ঐতিহ্যমূল অন্বেষণ করতে গিয়ে আধুনিক সাহিত্যের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অবশ্য এবিষয়ে ঐতিহাসিকদের বিবরণ অপেক্ষা সাহিত্যকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, মঙ্গলকাব্যগুলির আলোচনায় যেমন পাণ্ডুলিপির সাহায্য না নিয়ে সম্পাদিত গ্রন্থগুলিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে, তেমনি ঐতিহাসিকদের বিবরণও অনেকক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনা থেকেই নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও বিশিষ্ট পণ্ডিতদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিষয়গত আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য উল্লিখিত কালপর্ব মধ্যযুগ হলেও প্রাচীন বা আধুনিক যুগও আলোচনায় এসেছে। বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত থেকে মোগল আমল, ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী জাতির আগমন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের কথাও এসেছে। এভাবে বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিবর্তন চিত্র স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বিভাগগুলি হল ঃ

১। বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, বাদ্যযন্ত্র, অলঙ্কার, সাজসজ্জা

প্রসাধন ইত্যাদি।

২। আচার-বিচার ও সংস্কার-বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ রীতিনীতি, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

৩। ভাব-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ শিক্ষা-সংস্কৃতি।

৪। স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ লোকক্রীড়া, শরীরচর্চা ইত্যাদি।

৫। বাক্-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, ছড়া ইত্যাদি।

সমাজ ইতিহাসের তথ্যগুলিকে মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখানো হয়েছে। এবিষয়ে কোন মঙ্গলকাব্যের একাধিক সংস্করণ ব্যবহৃত হলেও শুধুমাত্র আকরগ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত সংস্করণগুলি থেকেই উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে। আকর গ্রন্থ ও মধ্যযুগে রচিত অন্যান্য সহায়ক গ্রন্থগুলি থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে উদ্ধৃতির পাশে কবির নাম ও তার পাশে পৃষ্ঠা সংখ্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন, উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বিজয় গুপ্তের তেত্রিশ (৩৩) পৃষ্ঠার একটি উদ্ধৃতি নিলে— (বিজয়/৩৩), এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচনামূলক গ্রন্থ থেকে গৃহীত তথ্য ও উদ্ধৃতির গ্রন্থনাম ও পৃষ্ঠা সংখ্যা অধ্যায়ের শেষে তথ্যপঞ্জীতে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যবহৃত সমস্ত গ্রন্থাবলীকে আকর গ্রন্থ ও সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে ভাগ করে 'গ্রন্থপঞ্জী' অংশে সংযোজন করা হয়েছে।

গ্রন্থভিত্তিক অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে পূর্বোল্লিখিত পাঁচ ভাগে ভাগ করে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া কাব্য কাহিনী ও ঘটনাগত বিশ্লেষণ সহ সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাপত্রটিতে সর্বমোট আটটি অধ্যায় আছে। অধ্যায়গুলির শিরোনাম এবং অধ্যায়গুলিতে উপস্থাপিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তথা মঙ্গলকাব্যের পশ্চাদ্‌পট বিশ্লেষণ

তুর্কী আক্রমণ পূর্ব বাঙালী সমাজ ছিল নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের মত। সেখানে সর্বপ্রথম অভিঘাত সৃষ্টি করে তুর্কী আক্রমণ। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে তুর্কী আক্রমণকে কেন্দ্র করে বাঙালী হিন্দুসমাজে যে অস্থিরতা দেখা দেয় তার মধ্যে থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষা ও হিন্দুর জাগরণের প্রয়োজন হয়েছিল। এই প্রয়োজন থেকেই উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজে জনমিশ্রণের সুযোগ এসেছিল। এর ফলে মনসা ও চণ্ডীর মত বিভিন্ন ব্রতকথার দেবীরা সমাজের উচ্চশ্রেণীতে উঠে আসার সুযোগ পেল। যে সমস্ত দেবদেবীর কাহিনী ব্রতকথার আকারে ছড়িয়ে ছিল তাদের কাহিনী নিয়ে মঙ্গলকাব্য তৈরী হল। ব্রতকথার প্রধান দেবদেবী ছাড়াও অপ্রধান দেবদেবীকে নিয়ে অপ্রধান মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। ব্রতকথার মধ্যে থেকেই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ঘটেছিল।

অনুবাদ সাহিত্যেরও উদ্ভব অনুরূপ পরিস্থিতির মধ্যে থেকেই। হিন্দুর আদর্শ ও বীরগাথা জনসমাজে প্রচারের প্রয়োজন থেকেই অনুবাদ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কেননা সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষের সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি পড়ার অধিকার ছিল না, তাই রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের

মত গ্রন্থগুলি বাংলায় অনুবাদের মধ্যে দিয়ে জনসমাজে প্রচার করা হয়েছিল।

চৈতন্য-পূর্ব যুগেই বৈষ্ণবপদসাহিত্য রচনার ধারা গড়ে উঠেছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই ধারাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে, মূলত ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের নেতৃত্বে বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। বৈষ্ণবধর্মকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবপদসাহিত্য একটা নতুন মাত্রা পেয়েছিল। অপরদিকে দেবকল্প শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে চৈতন্য জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্মীয় উপাখ্যান ছাড়াও রোমাণ্টিক প্রণয় কাব্যের স্বতন্ত্র ধারা গড়ে উঠেছিল। সেখানে মুসলমান কবিদের দ্বারা রচিত কাব্যগুলিতে মানবীয় প্রেম-প্রীতি, কামনা-বাসনা ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। বিদেশী,ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় রচিত সাহিত্যের অনুবাদ হলেও বাঙালী কবি বিদেশী কাহিনীকে দেশ- কালের পটভূমিকায় স্থাপন করেছিলেন।

প্রথম অধ্যায়ে মধ্যযুগের আর্থসামাজিক পটভূমিকায় কিভাবে বিভিন্ন সাহিত্যধারার উদ্ভব ঘটল এবং ব্রতকথা, ছড়া ও পাঁচালীর মধ্যে থেকে মঙ্গলকাব্যের জন্ম হল অর্থাৎ ব্রতকথার সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের সম্পর্কের দিকগুলি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মনসামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

মনসামঙ্গল কাব্যের কবিদের সময়কাল ও ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালীর সমাজ ইতিহাসের তথ্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রধান প্রধান কবিদের কাব্যে প্রাপ্ত লোকজীবন সম্পৃক্ত খাদ্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে সাজসজ্জা, সংস্কার-বিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাথমিক পরিচয় আছে এখানে। এখানে দেখা যায় সময়ের নিরিখে মনসার ক্রুরতা এবং চাঁদসদাগরের উগ্র ব্যক্তিত্ব হারিয়ে সাধারণ মানুষের মত হয়েছে। সমসাময়িক রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তৈরী করা হয়েছে এখানে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

চণ্ডীমঙ্গল যেহেতু মূলত ষোড়শ শতাব্দীর কাব্য, তাই পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়ের মতই ষোড়শ শতাব্দীর সমাজ ইতিহাসের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে অনেকটা জাতপাতহীন সমাজ গড়ে উঠেছিল। এপর্বের বাংলায় মোগল শাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ করা গেল চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

ধর্মমঙ্গল কাব্য মূলত সপ্তদশ শতাব্দীর সৃষ্টি হলেও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং সপ্তদশ শতব্দীর পরিবর্তিত আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোল্লিখিত অধ্যায়ের মত সামাজিক ইতিহাসের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। রাঢ়বঙ্গের মানুষের ইতিহাসই প্রধানত ধর্মমঙ্গলে প্রাধান্য লাভ করেছে। তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত সমাজের চেহারা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

রামকৃষ্ণ রায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কাব্য রচনা করলেও প্রধান কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই কাব্য রচনা করেছিলেন। যুগ পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ইতিহাসের তথ্যগুলি তুলে ধরে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মবোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ অন্নদামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

অষ্টাদশ শতাব্দী বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ। এসময় পুরাতন রীতিনীতির প্রতি যেমন মোহ ছিল, তেমনি নতুনের প্রতিও সমান আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল। দৈববাদ বা যুক্তিবাদ কোনটিই নয়, একটা দোলাচলতা হল এই পর্বের সমাজ ইতিহাসের বিশেষত্ব। এর মধ্যে থেকে আধুনিক জীবনযাত্রার সূত্রপাত লক্ষ করা যেতে পারে, আধুনিক যুগের সঙ্গে মধ্যযুগের অন্বয়সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এ পর্বের সামগ্রিক পরিস্থিতি অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে তুলে ধরা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় ঃ মনসামঙ্গল কাব্য থেকে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের বিবর্তন

সমাজ স্থিতিশীল নয়— এই ধারণাটিকে সামনে রেখে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ক্রম বিবর্তিত সমাজ ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে সংগৃহীত তথ্যের আলোকে সমাজবৃত্ত, অর্থনীতি ও ধর্মবোধের যে পরিবর্তন ঘটছিল, মঙ্গলকাব্যকে ভিত্তি করে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিবর্তন শব্দটির অর্থ পরিবর্তন বা রূপান্তর, এর সঙ্গে মন্দ-ভালো বা উন্নতি-অবনতির সম্পর্ক নেই। দীর্ঘ কয়েক'শ বছর ধরে বাঙালীর সামাজিক পরিকাঠামোগত, যেমন জাতি-বৃত্তিগত, আর্থসামাজিক বিবর্তন ঘটেছে তেমনি বাঙালীর মানসিক দিক থেকেও, যেমন - সমাজে নারীর স্থান, ব্রাহ্মণের উত্তরাধিকার, মানবচরিত্র, মানসিক গঠন, ধর্মবোধ ইত্যাদিরও পরিবর্তন ঘটে গেছে। পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতে মূলত তথ্য চয়ন করা হলেও একই ধারার কাব্যে বিশেষত যেগুলি ভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে বা কালগত ব্যবধানে রচিত হয়েছে তাতে যে পরিবর্তনগুলি ফুটে উঠেছে তা ধরা হয়েছে। তবে বিভিন্ন ধারায়, বিভিন্ন কালের যে বিবর্তন চিত্র তার একটা সামগ্রিক উপস্থাপনা আছে এই অধ্যায়ে।

অষ্টম অধ্যায়ঃ সমাজ বিবর্তনের ধারায় বাঙালীর ঐতিহ্য

মধ্যযুগের অবস্থানকে কাটিয়ে আধুনিক যুগে উন্নয়ন কোন্ পথে, কিভাবে হয়েছে তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে উপসংহারে। আধুনিক যুগে বাঙালী তার ঐতিহ্যগত চিরাচরিত জীবনধারা থেকে কতটা সরে এসেছে বা কতটা নিজস্বতাকে ধরে রেখেছে তা আধুনিক সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে ও বর্তমান জীবনযাত্রার মধ্যে থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যপঞ্জী

১। সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ ৮৩২।

২। বঙ্কিম রচনাবলী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৩০।

৩। রবীন্দ্র রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দশম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩।